কালের কন্ঠ, ১৪ নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা নং-১৭, শ্রেণীসংখ্যা- ০৭০.৪০৮

কালের কণ্ঠ, ১৪-১১-১২, পৃ: ১৭

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ ▶

ওষুধ কম্পানিগুলোর অনৈতিক ওষুধ বিপণন

বিশ্বজুড়ে ওষুধ কম্পানিগুলোর অনৈতিক ওষুধ বিপণন (Drug promotion) জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই অনৈতিক ওষুধ বিপণনে সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করে থাকেন ওষুধ বিক্রেতা, মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ ও চিকিৎসকরা। ওষুধ বিপণনের উদ্দেশ্য যদি হয় স্রেফ মুনাফা, তবে এর কারণে বড় ধরনের খেসারত দিতে হয় রোগীকে। বহু চিকিৎসক ওষুধ কম্পানি কর্তৃক প্রতারিত হয়ে অনেক সময় সুস্থ মানুষকে রোগী বানিয়ে ওষুধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। আবার অনেক সুস্থ-সবল মানুষ ওষুধ কম্পানির বিজ্ঞাপনের প্ররোচনায় পড়ে আরো বেশি সুস্থ, সবল ও সুন্দর জীবনের জন্য অপ্রয়োজনীয় ও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ওষুধ গ্রহণ করে। এসব ওষুধকে বলা হয় লাইফস্টাইল ড্রাগ। ফুড সাপ্লিমেন্ট, ভিটামিন, টনিক, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, স্থূলতা কমানোর ওষুধ, যৌন অক্ষমতা, মাথার টাক, মন চাঙ্গা করার ওষুধ—এসব ড্রাগের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে ওষুধের বিজ্ঞাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অনেক দেশেই ওষুধের বিজ্ঞাপন প্রচার বৈধ। বিজ্ঞাপন অনেক সময় মানুষকে মোহাবিষ্ট করে। যথাযথ তথ্যবিহীন রং-বেরঙের চটকদার বিজ্ঞাপন মানুষকে বিভ্রান্ত করে। কাটতি বাড়ানোর জন্য পণ্যের বিজ্ঞাপনে উৎপাদকরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে। বলা হয়ে থাকে, বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে বিজ্ঞাপনের কোনো বিকল্প নেই। বিজ্ঞাপনে তুলনামূলক বিচারে পণ্যের গুণগত মান ও কার্যকারিতার ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়। কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখে বা পড়ে কোনো পণ্যের কার্যাবলি বা গুণগত মান সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কোনো ধারণা পাওয়া মুশকিল। তাই পণ্যের ব্যবহার বা গ্রহণ আবশ্যক। যেমন এক ব্র্যান্ডের ক্যান্ডি অন্য ব্র্যান্ডের ক্যান্ডির চেয়ে বেশি ভালো কি না, তা না খেলে বোঝা যাবে না।

> ওষুধ প্রমোশনে কোটি কোটি টাকা খরচের ভারটা রোগী বা ওষুধ ক্রেতাকেই বহন করতে হয়। এতে ওষুধের দাম আকাশচুম্বি হয়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। চিকিৎসকদের অজ্ঞতা, অবহেলা বা পড়াশোনার অভাবে নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধও রোগীর হাতে পৌঁছে যায় ওষুধ কম্পানি ও বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। এটা জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে

!!!
মানুষ মোটা তাজা
ঔষধ... আমন
বাজারের সেরা

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষ পণ্যের পরিচিতি লাভ করলেও অমূলক ও বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে উৎপাদকরা ধোঁকা দেয়। যেমন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হরহামেশাই অনেক প্রসাধনীর বিজ্ঞাপন দেখি, যেখানে গায়ের রং ফর্সা করার প্রচারণা চালানো হয়। কোনো প্রসাধনী ব্যবহার করলে গায়ের রং ফর্সা হয়, এ কথা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এই মিথ্যা প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ প্রসাধনীগুলো কিনছে। কিন্তু ওই প্রসাধনী ব্যবহার করে কেউ কালো থেকে ফর্সা হয়ে গেছে বলে এ পর্যন্ত শোনা যায়নি। তবে ভোগ্যপণ্য আর ওষুধ এক নয়। ভোগ্যপণ্য জীবনরক্ষাকারী অত্যাবশ্যকীয় বস্তু নয়। ওষুধ অত্যাবশ্যকীয় জীবনরক্ষাকারী বস্তু। সঠিক সময় সঠিক মাত্রায় সঠিক ওষুধটি প্রয়োগ না করলে কোনো কোনো অবস্থায় মানুষ মৃত্যুবরণ করতে পারে। মারাত্মক ও জটিল সংক্রামক রোগের কথাই ধরা যাক। জটিল সংক্রামক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংসের জন্য আমাদের প্রয়োজন সঠিক মাত্রার গুণগত মানসম্পন্ন একদম সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক। অ্যান্টিবায়োটিক নির্বাচনে ভুল হলে রোগ ভালো হবে না, রোগীর ভোগান্তি বাড়বে, এক সময় হয়তো রোগী মারাও যাবে। সংক্রমক রোগের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো অবকাশ নেই। সংক্রামক রোগের ধরন যেমন ভিন্ন হয়, তেমনি অ্যান্টিবায়োটিকের ধরনও ভিন্ন হতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রেই উৎপাদকের জোরালো বিপণন ও চিকিৎসকদের অনৈতিক আচরণের কারণে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের মাত্রা অতীতের সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শুধু ব্যবসায়িক কারণে আজকাল চিকিৎসকরা সাধারণ সংক্রামক রোগেও সস্তা ও ন্যারো স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিকের (যেসব অ্যান্টিবায়োটিক বিস্তৃত পদের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে না) কার্যাবলির পরিবর্তে নামিদামি ও পেটেন্টেড ব্রোড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক রোগীকে প্রদান করছেন। কোনো কোনো সংক্রামক রোগে ন্যারো স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক কাজ না করলে ব্রোড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক (যেসব অ্যান্টিবায়োটিক বিস্তৃত পদের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে) প্রদান করে রোগ সারানোর সুযোগ থাকে। কিন্তু রোগীকে শুরুতেই ব্রোড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হলে এবং সে ওষুধ কাজ না করলে তখন হাতে আর কোনো বিকল্প থাকে না। সে জন্য আমরা বলে থাকি, কার্যকর ও অব্যর্থ অ্যান্টিবায়োটিকগুলো রোগীর দুঃসময়ের জন্য মজুত রাখুন। কিন্তু চিকিৎসকরা অতি দ্রুত রোগ সারিয়ে রোগীর আস্থা ও সুনাম অর্জনের মাধ্যমে ব্যবসার প্রসার বাড়াতে অত্যন্ত দামি ও ব্রোড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করে থাকেন। তাঁরা খুব কমই ভাবেন, ভুল ও নির্বিচার অপব্যবহারের কারণে জীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেলে শেষ সম্বল হিসেবে তাঁরা কোন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন। ওষুধ কম্পানিগুলোর আক্রমণাত্মক প্রমোশন, চিকিৎসকের অবিবেচনাপ্রসূত প্রেসক্রাইবিং ও রোগীর আত্মচিকিৎসায় নির্বিচারে ব্যবহারের কারণে ইতিমধ্যে বহু অ্যান্টিবায়োটিক জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকারিতা হারিয়ে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। এটি মানব সভ্যতার জন্য একটি মারাত্মক দুঃসংবাদ। আমরা মনে করি, হয়তো ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে, যখন অ্যান্টিবায়োটিকের অভাবে অসহায়ভাবে রোগী মৃত্যুবরণ করবে। আর চিকিৎসকদের অসহায়ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না।

ওষুধ কম্পানিগুলো বাজারজাত করার সময় ওষুধের ওপর বিভিন্ন তথ্যাবলি দিয়ে লিফলেট বা আকর্ষণীয় ফোল্ডার প্রকাশ করে। ওষুধ বিক্রয় প্রতিনিধি (মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ) এসব তথ্যসংবলিত কাগজপত্র চিকিৎসকদের মধ্যে বিলি করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা এসব বিজ্ঞাপনের ফিরিস্তি পড়ার সময় ও সুযোগ পান না। বিক্রয় প্রতিনিধিরাই চিকিৎসকদের কাছে তাঁদের কম্পানির ওষুধের গুণাবলি ও কার্যকারিতার ফিরিস্তি উপস্থাপন করেন। ওষুধের লিফলেট বা বিজ্ঞাপনে অনেক সময় অতিরঞ্জিতভাবে ওষুধের গুণাবলি তুলে ধরা হয়। কার্যকর না হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো রোগে ওষুধটি খুব ভালো কাজ করে বলে দাবি করা হয়। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা বিষক্রিয়া সম্পর্কে খুব কমই লেখা থাকে, বলাও হয়ে থাকে অতি অল্প। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা যাচাই-বাছাই না করেই এসব ওষুধ প্রেসক্রাইব করা শুরু করেন। এতে রোগী বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমত, ওষুধটি দামি হলে রোগীকে অধিক পয়সা ব্যয় করতে হয়, যেখানে সস্তায় একই মানের একই ওষুধ পাওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সব কম্পানির ওষুধের গুণগত মান সমান নয়। অর্থ বা উপহারের বিনিময়ে চিকিৎসক গুণগত মান যাচাই না করে কোনো ওষুধ প্রেসক্রাইব করলে রোগী শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বিক্রয় প্রতিনিধি বা চিকিৎসকদের এসব অপকর্ম সমর্থন করে না।

ড. শ্রীনাথ রেড্ডির নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের এক বিশেষজ্ঞ দল সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখতে পায় যে ২০০৮-০৯ সালে ভারতের বার্ষিক বিক্রির ২৫ শতাংশ অর্থ ওষুধের বিপণনে ব্যয় করে যেখানে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ রাখে মাত্র ৭ শতাংশ। সমীক্ষায় বলা হয়, ভারতের বাজারে প্রায় ৯০ হাজার ব্র্যান্ডের ওষুধ প্রচলিত আছে। এসব ওষুধের মধ্যে বেশির ভাগই হলো অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধ। ভারতের ১০টি শীর্ষস্থানীয় ওষুধের (যেগুলোর বিক্রির পরিমাণ মোট ওষুধ বিক্রির ১০ শতাংশের কাছাকাছি) রয়েছে মাল্টিভিটামিন, কফ সিরাপের অযৌক্তিক মিশ্রণ ও একটি লিভারের ওষুধ—যার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়নি। ১৯৯৯ সালে বিক্রি করা ২৫টি শীর্ষস্থানীয় ওষুধের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল রক্তের টনিক, কফ সিরাপ, লিভারের ওষুধ, ব্যথানাশক, ভিটামিন খনিজ পদার্থ, হজমকারক এনজাইম ইত্যাদি।

বাজারে হাজার হাজার ব্র্যান্ডের ওষুধের উপস্থিতির কারণে সঠিক ওষুধের যৌক্তিক প্রয়োগ করা চিকিৎসকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। লাগামহীন মুনাফার উদ্দেশ্যে ওষুধ কম্পানিগুলো ওষুধ সম্পর্কে যেসব তথ্য উপস্থাপন করে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটুকু, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় ও মানসিকতা থাকে না বেশির ভাগ চিকিৎসকের। চিকিৎসা পেশার নৈতিকতার নীতিমালা অনুসারে চিকিৎসকরা ওষুধের ওপর পরিপূর্ণ তথ্যাবলি অর্জন না করে কোনো রোগীকে ওষুধ দিতে পারেন না। প্রকৃত সত্য হলো, আমাদের মতো দেশে চিকিৎসকরা ওষুধ সম্পর্কে যা জানেন বা শোনেন, তা আসে বিক্রয় প্রতিনিধিদের কাছ থেকে। ওষুধ কম্পানিগুলো দাবি করে তাদের উৎপাদিত ওষুধ অন্য ওষুধের চেয়ে নানা দিক থেকেই উন্নত মানের এবং বেশি কার্যকর। তারা যা দাবি করে অনেক সময় তার সঙ্গে বাস্তবতার মিল থাকে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ওষুধ কম্পানিগুলো তাদের লিফলেট বা চিত্তাকর্ষক তথ্য বিবরণীতে যেসব তথ্য উপস্থাপন করে, তার সঙ্গে বিজ্ঞানসমর্থিত তথ্যাবলির প্রচুর গরমিল ও তারতম্য রয়েছে। যেমন একটি কম্পানি ৮০ মিলিগ্রামের ডায়াবেটিসের ওষুধ গ্লিক্লাজাইড সম্পর্কে লিখেছে, ওষুধটি হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে যাওয়া) উৎপন্ন না করেই রোগীর শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা ২৪ ঘণ্টা স্বাভাবিক রাখে। কিন্তু বাস্তবে ওষুধটির স্বাভাবিক কার্যকারিতার মেয়াদ ২৪ ঘণ্টা নয়, ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা মাত্র। ২.৫ মিলিগ্রামের ইন্ডোপেমাইড হৃৎপিণ্ডকে ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে বলে দাবি করা হয়। এ ছাড়া ওষুধটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডাইইউরেটিক (মূত্র বর্ধনকারী) হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ইন্ডোপেমাইড উচ্চ রক্তচাপে কার্যকর হলেও দাবি অনুসারে এর হৃৎপিণ্ড সংরক্ষণে কোনো কার্যকারিতা নেই। ভিটামিন-ই সম্পর্কে বলা হয়, এটি বয়োবৃদ্ধিকে (Aging Process) স্তিমিত করে, পেশি সংকোচন ও হৃদরোগ অ্যাথেরোসক্লেরোসিস বন্ধ করে। পেশি সংকোচনে ভিটামিন-ইর কিছুটা কার্যকারিতা থাকলেও অন্য দুটি ক্ষেত্রে এর কোনো কার্যকারিতা নেই।

ভিটামিনের বিজ্ঞাপন বা প্রচারে অতীতে (হয়তো এখনো) অনেক আজগুবি কথা শোনা যেত। ওষুধ কম্পানিগুলো ভিটামিন প্রমোশনে বিশেষ করে টার্গেট করে শিশু ও বৃদ্ধদের। মা-বাবা সব সময়ই সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। কোনো ওষুধ কম্পানি যদি দাবি করে, তাদের উৎপাদিত ভিটামিন শিশুর মেধা বিকাশে সাহায্য করে, বয়োবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে, পড়াশোনায় মনোযোগী করে তবে মা-বাবা সন্তানের জন্য অবশ্যই সেই ভিটামিন ক্রয় করবেন দাম ও আজগুবি কার্যকারিতার কথা বিবেচনায় না নিয়েই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রোগ সারাতে রোগী চিকিৎসকের কাছে গেলে তাঁরা প্রয়োজনীয় ওষুধের সঙ্গে প্রেসক্রিপশনে একাধিক অপ্রয়োজনীয় ওষুধ জুড়ে দেন। একবার আমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। ইউরিক এসিড বেশি বলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলাম। আমি যে একজন ফার্মাসিস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তা চিকিৎসককে বুঝতে দিইনি। তিনি প্রেসক্রিপশনে দুটি ওষুধের নাম লিখলেন, এর মধ্যে একটি ছিল এলোরিক (জেনেরিক : অ্যালোপিউরিনিল) ও অন্যটি নামিদামি মাল্টিভিটামিন। এলোরিক প্রেসক্রাইব করা ছিল একদম পারফেক্ট। কিন্তু মাল্টিভিটামিনের প্রয়োজন কী, তা বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি সুস্থ-সবল মানুষ, কোনো সমস্যা নেই, ভিটামিনের ঘাটতি আছে, তাও নয়। তার পরও কেন এই অযৌক্তিক ভিটামিন তা চিকিৎসকের কাছে জানতে চাইলাম। তিনি বলছিলেন, ভিটামিনটা ভালো, খেতে থাকুন উপকার দেবে। আমি মানতে নারাজ। নাছোড়বান্দার মতো আমি জানতে চাইলাম, কী উপকার এই ভিটামিন থেকে আমি পাব? তিনি অনেকটা খেপে গিয়ে যা বললেন, তার মর্মার্থ হলো, তিনি চিকিৎসক বলে ভিটামিনটি সম্পর্কে সব জানেন। আমি অজ্ঞ মানুষ, ওষুধ সম্পর্কে আমার ধারণা কম, তাই তর্কে যাওয়া আমার ঠিক হচ্ছে না। এবার আমি আমার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করলাম। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং সবিনয়ে প্রেসক্রিপশনটি চেয়ে নিয়ে ভিটামিনটি কেটে দিলেন। আমি বললাম, আপনি আমার পরিচয় পেয়ে আত্মরক্ষার জন্য অপ্রয়োজনীয় ভিটামিনটা বাদ দিলেন। একজন অজ্ঞ, অশিক্ষিত শ্রমিক, কৃষক বা সাধারণ রোগী হলে আপনি কী করতেন? 'চিকিৎসক সেদিন আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারেননি। চিকিৎসকদের এই অনৈতিক মানসিকতার পেছনে যা কাজ করে, তা হলো লোভ, লালসা, অধিক থেকে আরো অধিক উপার্জনের মনোবৃত্তি। নিজের ব্যক্তিত্ব, মানবিকতা, নৈতিকতা, আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বোধের কাছে আত্মসমর্পণ। না হলে একজন চিকিৎসক কী করে একটি ওষুধ প্রেসক্রাইব করার বিনিময়ে ওষুধ কম্পানির কাছ থেকে বৌয়ের জন্য একটি শাড়ি বা গহনা গ্রহণ করতে পারেন? একটি পারফিউম বা ফুলদানির জন্য একজন অসহায় দরিদ্র সাধারণ মানুষ, যিনি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে একজন চিকিৎসকের কাছে যান সুচিকিৎসা পাওয়ার আশায়, এ ধরনের একজন মানুষের ক্ষতি একজন চিকিৎসক কিভাবে করতে পারেন? বিশ্বস্ত সূত্রের বরাতে জানা যায়, ওষুধ কম্পানির কাছ থেকে চিকিৎসকরা (সৎ চিকিৎসক নন) যেসব উপঢৌকন পান এর মধ্যে রয়েছে নগদ টাকা, গহনা, দামি কাপড়-চোপড়, পারফিউম, অফিস ভাড়া, অফিস ডেকোরেশনের খরচ, চেম্বারের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব ও যন্ত্রপাতি, বিদেশ ভ্রমণের টিকিট, বিদেশে অবস্থানকালে হোটেল ভাড়া, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ফ্রিজ, টেলিভিশন, এয়ারকুলার ইত্যাদি। আমার সামনে ঘটে যাওয়া আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। একবার এক চিকিৎসক এক বিক্রয় প্রতিনিধির কাছ থেকে একটি ক্রিস্টাল ফুলদানি গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে সেই কম্পানির লোসার্টান পটাশিয়ামের ব্র্যান্ড নামটি (উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ) লিখে দিলেন এক রোগীর প্রেসক্রিপশনে। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। মজার ব্যাপার, সেই ওষুধের ব্র্যান্ড নামটিও চিকিৎসক জানতেন না। বিক্রয় প্রতিনিধির কাছ থেকে জেনে নিয়ে নামটি প্রেসক্রিপশনে লিখলেন। ওপরে উল্লিখিত লোভনীয় জিনিসপত্র ছাড়াও প্রত্যেক চিকিৎসক ওষুধ কম্পানি থেকে ফ্রি স্যাম্পল হিসেবে অসংখ্য ওষুধ পেয়ে থাকেন। আমি বুঝি না, এসব ওষুধ দিয়ে চিকিৎসকরা কী করেন! শোনা যায়, বিক্রি করে নগদ টাকা উপার্জন করেন। তবে অনেক চিকিৎসক গরিব রোগীদের এসব ওষুধ দান করেন বলেও শোনা যায়। আমরা যতই বলি না কেন, সব মানুষকে এক কাতারে অবশ্যই ফেলা যায় না, ফেলা উচিতও নয়। তবে ওষুধ কম্পানি, চিকিৎসক, বিক্রয় প্রতিনিধিদের এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হওয়া দরকার। ওষুধ প্রমোশনে কোটি কোটি টাকা খরচের ভারটা রোগী বা ওষুধ ক্রেতাকেই বহন করতে হয়। এতে ওষুধের দাম আকাশচুম্বি হয়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। চিকিৎসকদের অজ্ঞতা, অবহেলা বা পড়াশোনার অভাবে নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধও রোগীর হাতে পৌঁছে যায় ওষুধ কম্পানি ও বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। এটা জনস্বাস্থ্যের জন্য এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ওষুধ কম্পানি, চিকিৎসক ও বিক্রয় প্রতিনিধিদের অশুভ ও অনৈতিক তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। ভারতে এ ব্যাপারে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। কোনো চিকিৎসক উপহার নিলে তাঁর চিকিৎসা সনদ বাতিল করার বিধান রাখা হচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ (ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে ওষুধ বিজ্ঞাপনে ওষুধ কম্পানিগুলো বছরে কত টাকা খরচ করে তা প্রকাশ করতে হবে, ভুতুড়ে লেখক দিয়ে কোনো ওষুধের ওপর প্রবন্ধ লেখা হয় কি না তা জানাতে হবে। এ ছাড়া গবেষণার নামে ওষুধ কম্পানিগুলো চিকিৎসকদের কত টাকা প্রদান করে, কনসালটেশন ফি বাবদ ব্যয় কত, যাতায়াত ও আপ্যায়নে কত খরচ হয়, তা প্রকাশের বাধ্যবাধকতা বহাল করার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

ওষুধ কম্পানিগুলো তাদের লিটারেচারে যেসব তথ্য উপস্থাপন করে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যাচাই করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। কারণ ওষুধ কম্পানিগুলো যেসব তথ্য বিজ্ঞাপনে উপস্থাপন করে তা সর্বাংশে সত্য বা বিজ্ঞানসমর্থিত নয়। এ কথার পক্ষে আমি আগেই উদাহরণ পেশ করেছি। আমি সব সময় বলে এসেছি, চিকিৎসকদের সব সময় স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন অনুসরণ করে রোগীর চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এতে ভুল-ত্রুটি ও ওষুধ কম্পানির অনাচার কমে যায়। চিকিৎসকরা সব সময় স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন অনুসরণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন তাঁদের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হওয়ার অজুহাতে।

অনৈতিক ওষুধ বিপণন বন্ধে সরকারের কোনো উদ্যোগ আছে বলে অতীতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশের অসংখ্য পত্রপত্রিকায় এ ব্যাপারে অনেক প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে, প্রতিকারের উপায় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এ অরাজকতা বেশি দিন চলতে দেওয়া যায় না। চিকিৎসা ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি অনুধাবন করে সরকার জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে—এই প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের।

লেখক : অধ্যাপক, ফার্মাসি অনুষদ, ঢা বি ও প্রো-ভিসি, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

LIBRARY
43, Moha